কৃত্তিবাসী ইন্দ্রজিৎ :

রাবণের বীর পুত্র ইন্দ্রজিৎ। তিনি মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধ করতে পারেন। মায়াবী। বহু অস্ত্র তার করায়ত্ত। তিনি ইন্দ্রকে যুদ্ধে জয় করেছেন বলে ইন্দ্রজিৎ। তার আর এক নাম মেঘনাদ। মেঘের আড়ালে তিনি নাদ (নাদ শব্দের অর্থ ধ্বনি কিন্তু এখানে সম্ভবত যুদ্ধের হুঙ্কার) ছাড়তে পারেন। রাবণ মূলত তারই আশ্বাসে ও ভরসায় রামের সঙ্গে যুদ্ধে নামার বল সঞ্চয় করেছিলেন। রাবণের পক্ষের যে সমস্ত বীর যোদ্ধা ছিলেন তাদের

মধ্যে অন্যতম ইন্দ্রজিৎ।

বালি পুত্র অঙ্গদ যখন রাবণকে গালি দিতে যায় তখন সভার মাঝে দেবান্তক, অতিকায়, ধুম্রলোচন, ত্রিশিরা, নিশঠ, শঠ, কুম্ভ, নিকুম্ভ প্রমুখ বীরদের পাশে ইন্দ্রজিৎকে দেখেছিল। সকলে রাবণকে পরিবেষ্টন করে বসে ছিল। রাবণ যখন অনেক রাবণ হয়ে দেখা দেয় তখন ইন্দ্রজিতকে রাগিয়ে দেবার জন্য অঙ্গদ পরিহাস করে। রাবণের মুকুট নিয়ে অঙ্গদ পালিয়ে এলে অপমানিত রাবণ প্রথমেই যুদ্ধে পাঠিয়েছে ইন্দ্রজিতকে।

পিতার আদেশে মেঘনাদ সমর-সাজে সজ্জিত হলেন। বিপুল বিক্রমে সংগ্রাম আরম্ভ হলে রাক্ষস-সৈন্য অসংখ্য বাণ প্রয়োগ করতে লাগল। বানর সৈন্য বৃক্ষ-প্রস্তরখণ্ড উৎক্ষেপণ করতে লাগল। মেঘনাদ পূর্বরণাঙ্গন যুদ্ধপরিচালনা সমাপ্ত করে দক্ষিণ অঙ্গানে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেখানে অঙ্গাদের সঙ্গো যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করা। মেঘনাদ সেখানে তাঁর দর্শন পেলেন। তিনি অঙ্গাদকে কটূক্তি করতে আরম্ভ করলেন এবং অঙ্গাদও তাঁকে প্রচুর গালমন্দ করলেন। মেঘনাদ ক্রুদ্ধ যুদ্ধ করতে থাকলে তাঁর অস্ত্রে অসংখ্য বানরসৈন্য আহত ও নিহত হল এবং অনেকে পলায়ন করল। অঙ্গাদ একা পড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন। অঙ্গাদের বল-বিক্রমে সন্ত্রস্ত হয়ে মেঘনাদের সৈন্যরা চারিদিকে পলায়ন করলে মেঘনাদ ভীত হলেন এবং আকাশপথে উড্ডীয়মান হলেন। লক্ষ্মণও বীরত্বের সঙ্গো সংগ্রাম করতে লাগলেন। লক্ষ্মণের ভয়ে রাক্ষসেরা পলায়ন করতে থাকলে তা ইন্দ্রজিতের দৃষ্টিপথে এল। অসংখ্য সৈন্যক্ষয় এবং পরাজয়ের আশঙ্কায় মেঘনাদ লজ্জিত ও দুঃখিত হয়ে অন্য উপায়ে যুদ্ধ করার কথা ভাবতে লাগলেন। ইন্দ্রজিৎ মেঘান্তরাল থেকে যুদ্ধ করতে মনস্থ করলেন এবং মনের সাহসে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে সম্বর-বাণ উৎক্ষেপণ করলেন। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আহত হলেন এবং তাঁদের দেহ নির্গত শোণিতধারা প্রবাহিত হল। বানররাজ সুগ্রীব উত্তর রণাঙ্গানে অবস্থান করছিলেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র যুদ্ধ ছেড়ে এলেন। বিভীষণকে বিজাতীয় চিন্তা করে তাকে এই সংবাদ দেওয়া হল না। মেঘনাদ শরে জর্জরিত রাম-লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে নাগপাশ বাণ নিক্ষেপ করলেন। তা থেকে লক্ষ লক্ষ ফণী বহির্গত হল। এবং সর্পমুখ নির্গত অগ্নি বহির্গত হতে থাকলে সর্পবাণ দ্বারা মেঘনাদ দুই ভাইকে বন্ধন করে ফেললেন। সর্পবিষের দ্বারা রাম-লক্ষ্মণের দেহাভ্যন্তর জ্বলতে লাগল। অবশেষে তাঁরা অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। মেঘনাদ যুদ্ধের জয়োল্লাসে উল্লসিত হলেন। বানরগণ ভীষণ বিমর্ষ হল এবং তাদের কান্নায় আকাশ-পাতাল মুখরিত হল।

মেঘনাদ স্বর্ণলঙ্কায় গিয়ে সেদিনের যুদ্ধ-জয়ের শুভসংবাদ পিতাকে দিলেন এবং আদ্যোপান্ত যুদ্ধের বিবরণ দিলেন। রাবণ পুত্রকে চুম্বন, আলিঙ্গান ও নানা উপহারে সন্তুষ্ট করলেন।

এদিকে গরুড় স্মরণে রাম লক্ষ্মণের নাগপাশ থেকে মুক্তি ঘটল। তারপর রাক্ষস সৈন্যদের মধ্যে অনেকে মারা গেল। রাবণ যুদ্ধে এলেন। কুম্ভকর্ণ অতিকায় অন্যান্য রাক্ষস বীরেরা মারা যাওয়ার পর ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে এসেছে। পুত্রকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত দেখে জননীর গর্ব ও আনন্দ হল। পুত্র মেঘনাদ প্রণাম পূর্বক মাতৃসমীপে অশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। মেঘনাদ-জননী-মন্দোদরী পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর মস্তকে চুম্বন করলেন। এখানে মেঘনাদের মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মপরায়ণা মন্দোদরী শ্রীরামচন্দ্রের দেবত্বতত্ত্বে নিঃসন্দেহ ছিলেন। একথা তিনি পুত্র মেঘনাদকে বললেন। রাবণের দুর্মতির কথাও বললেন। মাতৃবাক্য শ্রবণের পর মেঘনাদ পিতার দুর্জয় প্রতাপের কথা মাতাকে বললেন। স্বামী-নিন্দা মহাপাপ থেকে মাতাকে বিরত থাকতে বললেন মেঘনাদ। এখানে ইন্দ্রজিতের বীরত্ব, পিতৃভক্তি, দেশপ্রেম ও মাতার প্রতি ভালোবাসা অভিব্যক্ত।

পূর্বরণভূমে গেলেন মেঘনাদ। পূর্বদ্বারে নীল বানর সেনার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাঁর সঙ্গো নীলের কথা-কাটাকাটি শুরু হল। ইন্দ্রজিৎ কপিদের ক্রন্দন শুনে হাসতে হাসতে আকাশ থেকে অগ্নিকণা সম অসংখ্য বাণ বর্ষণ করলেন। তারপর মেঘনাদ মেঘ-অন্তরালে লুক্কায়িত অবস্থায় শর নিক্ষেপণ পূর্বক শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে জর্জরিত করে ফেললেন। শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সেদিনকার মত পতন হল।

লঙ্কার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে নিশাচর বিদ্যুৎজিহ্বকে দিয়ে মায়া সীতা গড়িয়েছেন মেঘনাদ। আর সেই মায়া সীতাকে সর্বসমক্ষে বধ করেছে। তিনি মনে করেছেন রাম নিশ্চয় এতে প্রাণ ত্যাগ করবেন, আর রামকে দেখে লক্ষ্মণেরও ঐ একই অবস্থা হবে। পরে কপি গণ নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। ফলে বিনাযুদ্ধে, বিনা আয়াসেই লঙ্কা রক্ষা করা সম্ভব হবে। ইন্দ্রজিৎ এই মায়াসীতাকে বধ করলে বিভীষণ মায়া সীতা বধের ঘটনাটি সবাইকে বোঝালেন। এর পরেই বিভীষণ ইন্দ্রজিৎ-বধের উপায় বলে দিলেন। ঠাকুর লক্ষ্মণ বিভীষণের সঙ্গো গিয়ে তাঁর যজ্ঞ পণ্ড করবেন। তাতেই মারা যাবেন ইন্দ্রজিৎ। যজ্ঞাগারে পৌঁছে হনুমান যজ্ঞ নষ্ট করে দেয়। বিভীষণ লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলার যজ্ঞাশালা দেখিয়ে দিলেন এবং যজ্ঞ শেষ হওয়ার আগেই মেঘনাদকে মারতে বললেন।

দূর থেকে ইন্দ্রজিৎকে দেখে লক্ষ্মণ তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেই সময় ইন্দ্রজিৎও তাকে দেখতে পেলেন। লক্ষ্মণকে দেখে ইন্দ্রজিৎ বিস্মিত হলেন। কিন্তু তাঁর পিছনে খুড়া বিভীষণকে দেখে মেঘনাদ সমস্ত কিছু বুঝতে পারলেন। বিভীষণের কাজের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করলেন। তাকে বললেন--

রাক্ষসকূল ছাড়িয়া খুড়া গেলা হে মানুষে।
ভাই ভাইপো খুড়া না থুইলা বংশে।।
লঙ্কার ক্রন্দন খুড়া যেইজন শুনে।
বুক বিদরিয়া সে মরয়ে তখনে।।
রাক্ষসকুল ক্ষয় করিয়া ক্ষমা নাহি মনে।
সন্ধান করিয়া বৈরী আনিলা নিজ স্থানে।।
দুই কুল খাইলা বুড়া হৃদয় নিষ্ঠুর।
তোমা দরশনে পাপ বাড়য়ে প্রচুর।।

নির্গুণ সগুণ হয় তবু সে গেঁয়াতি।
সভে মেলি এক ঠাঞি করিব বসতি।।

এইভাবে ভর্ৎসনা করার পর সে বিভীষণকে বলল বানর কটক নিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে, তার পূর্ণাহূতি দেওয়া হলেই বর লাভের পর সে যুদ্ধ করবে। বিভীষণ ইন্দ্রজিতের কথা শুনে সহ্য করতে না পেরে তাকে তিরস্কার করে রাবণের অধর্মের কথা বললেন। তারপর সংগ্রাম শুরু হল। ইন্দ্রজিৎ বীরত্বের সঙ্গো যুদ্ধ করেও লক্ষ্মণের ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা নিহত হলেন। লঙ্কার পঙ্কজ রবি অস্তাচলে গেল।

ইন্দ্রজিত চরিত্রটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তার বীরত্ব যেমন আছে তেমনি আছে পিতৃ মাতৃভক্তি। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসাতেই তিনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছেন। বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতাকে তিনি মেনে নেন নি। সুতরাং এরকম একটি বীর চরিত্র দুর্লভ।